বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ

প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য

অসমিয়া থেকে ভাষান্তর : বাসব রায়

ঐ আই ফাঁই ফাঁই আফা ফাঁই
জাংনি খ'র'নি জাংছিখৌ হীগার্‌ফাই
ছিজৌনি ছিরা চির্‌রা
বাথৌনি বান্দৌয়া বান্দোবা
থায়গিরনি বিখণ্ডা খংবা
মৌন্‌ছিন্‌ছিন বীরায়নি আছারাবী ফাংবা।' (বন্দনা)

মা গো আমার এসো
বাবা গো আমার এসো
আমাদের মাথার উপরের জটগুলো সরাও
ফণীমনসা গাছে শিরা পাঁচটা
বাথৌর বাঁধ পাঁচটা
চালতার খোসা পাঁচটা
ম'নিছিনছিন প্রভুর আচার পাঁচটা।
(ভাবানুবাদ)

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য অসম। এই রাজ্যটি প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামাখ্যাদেশ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এখানকারই প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হলেন বোড়োরা। তাঁদের প্রধান আরাধ্য দেবতা বাথৌ বা শিব। পুজো-পার্বণে তাঁর উদ্দেশে উপর্যুক্ত মন্ত্র আওড়ানো হয়। এই মন্ত্র দিয়ে গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে বোড়ো কবিতার বিকাশ সম্পর্কে আমি নিজের অনুভব ব্যক্ত করতে চাইছি। প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের পবিত্র স্মৃতিচারণ উপলক্ষেই আমার এই বক্তৃতা, তাঁর উত্তরসূরি বিদ্যোৎসাহী অনুজ সুহৃদ শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্যের একান্ত অনুরোধ রক্ষা করাও আমার বক্তৃতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বোড়ো কবিতার পটভূমি হল ছয় দশকের বেশি সময় ধরে চলমান বোড়ো ভাষার গবেষণা ও চর্চা। বিষয়ের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে এই বোড়ো কবিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে হয়েছিল। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষার মুখে কোনোদিন পড়িনি। গুরুজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাষাবিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ শেখার সময় এই আপ্তবাক্য মাথায় ঢুকে গিয়েছিল যে, গদ্যের চেয়ে পদ্য অনেক এগিয়ে। অর্থাৎ কথার চেয়ে কবিতা বেশি শক্তিশালী। কবিতা মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির ধ্বনিময় প্রকাশ। কবিতা গভীরতম নীরবতার মধ্যে উজাড় করে দেয় আবেগ ও অনুরাগ। এরকমই কিছু সংজ্ঞা আমরা শুনেছি অধ্যাপক ও গুরুজনদের মুখে কিংবা তাঁদের লেখালিখিতে। এই প্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে, বাথৌ দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র আউড়ে বা সে-রকমই কোনো ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে আদিযুগে বোড়োদের ধ্যানধারণা প্রভাবিত হয়েছিল। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধনই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। বোড়ো কবিতাতেও জীবনের এই লক্ষ্য প্রতিভাত।

বোড়ো সাহিত্যের আলোচনায় সাধারণত তিনটি পর্বে যুগবিভাগ করা হয়। অসমে ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই এই যুগগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : 'বিবার' (ফুল) যুগ (১৯২০-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ), 'অলংবার' (তারা) যুগ (১৯৩৮-

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) ও আধুনিক যুগ (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)। গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা প্রসন্নকুমার বোড়ো খাকলারি প্রণীত ধর্মমূলক কবিতার বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এটিই বোড়ো কবিতার বইয়ের প্রথম নিদর্শন বলে জানা গেছে। বোড়ো লেখক অমৃত খেরকটারির রচনা থেকে আমরা বইটির বিষয়সূচি সম্পর্কে জানতে পারি। বইটিতে 'গুরু খুলুমনায় গিছ' (গুরু প্রণামের গান), 'মোদায়নি হিসাব' (দেবতার সংখ্যা), 'বাথৌবৌরায়া মাথৌ খুরজিদাং' (বাথৌদা কাকে সৃষ্টি করেছেন) ও 'বুলি বুরৈয়া মানৌ বৌর্‌বান সামিগিরি' (লক্ষ্মী কাকে বর দিয়ে থাকেন) ইত্যাদি বিষয়ক গীত-পদ সন্নিবিষ্ট রয়েছে বলে অমৃত খেরকটারি জানিয়েছেন।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বোড়ো ছাত্র সম্মেলন হাতে-লেখা একটি পত্রিকা বের করে। যার নাম 'বিবার লাইসি' (ফুল পত্রিকা)। ১৯২৪ সালে পত্রিকাটি প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির আটটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন দোতমা অঞ্চলের বিশিষ্ট বোড়ো লেখক সতীশচন্দ্র বসুমতারি।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'খন্থায় মেথায়' (কবিতা ও গান) নামে গীতি ও কবিতার একটি সংকলন। এতে ছিল মোট পনেরোটি কবিতা। মূলত শিক্ষা, সমাজ, বোড়ো জাতির উন্নয়নই ছিল কবিতাগুলির বিষয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত লেখক রূপনাথ ব্রহ্ম ও মদারাম ব্রহ্মের যৌথ সম্পাদনায়।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় মদারাম ব্রহ্ম রচিত 'বর'নি গুদি সিবসা আরৌ আরজ' (বোড়োদের মূল আরাধ্য ও বন্দনা) নামে পৌরাণিক তত্ত্বমূলক একটি বই। বইটি দুভাগে বিভক্ত— সিবসা ও আরজ (ধর্ম ও প্রার্থনা); বইটিতে পদ্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে বোড়োদের ধর্ম ও স্তুতিমন্ত্র।

প্রখ্যাত কবি ঈশান মুসাহারি রচিত এগারোটি কবিতার সংকলন 'সনানি মালা' (সোনার মালা) 'বিবার' (ফুল) যুগের নব্য রোম্যান্স, প্রাকৃতিক ও জাতীয় ভাবধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বাদারি' (কাঠুরে), 'মৌনাবিলি' (গোধূলি), 'গৌসৌ মৌব্লিব' (অস্থির মন), 'আলাখালা হারসিঙে' (নির্লিপ্ত একাকী), 'মৌদৈ' (অশ্রু), 'দুমথেনায় বিবারবারি' (সীমানাঘেরা ফুলের বাগান), 'বেংখা' (বাঁকা), 'হাজো' (পাহাড়), 'গৌথৈবারি' (শ্মশান), 'সিমান' (স্বীকারোক্তি), 'সম জাবায়' (সময় হল)— এই এগারোটি কবিতার সংকলন হিসাবে ঈশান মুসাহারির 'সনানি মালা' এক যুগোত্তীর্ণ অবদান। প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সংকলিত-সম্পাদিত 'হাথরখি হালা' পত্রিকায় ঈশান মুসাহারির কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিবার' ও' অলংবার' যুগের কয়েকটি বোড়ো পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য— 'বিবার' (ফুল), 'জেন্‌থখা' (মেহেন্দি গাছের ফুল), 'হাথরখি হালা' (তারামণ্ডল), 'অলংবার' (তারা), 'অখাফৌর' (চাঁদ), 'বোড়ো লিরথুম বিলায়' (বোড়ো সংকলন পত্রিকা)। এই যুগের কয়েকজন কবি হলেন— রূপনাথ ব্রহ্ম, মদারাম ব্রহ্ম, ঈশান মুসাহারি, দ্বারেন্দ্র বসুমতারি, প্রমোদ ব্রহ্ম, কালীকুমার লাহারি, মণিরাম সানফ্রামহারি, জয়ভদ্র হাগজের, প্রমথেশ প্রমুখ।

প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সম্পাদিত 'হাথরখি হালা' (তারামণ্ডল) পত্রিকায় ২২টি বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে। এই সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল কালীকুমার লাহারি, মণিরাম সানফ্রামহারি প্রমুখ কবির কবিতা।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় 'খন্থাই বিহুং' (কাব্য সংগ্রহ) নামে কবিতার বইটি। ১৯৫১ সালে কালীকুমার লাহারি নামে এক লেখকের 'খন্থাই বিজাব' (কাব্য গ্রন্থ) নামে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে মোট সতেরোটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রেম, হাস্য, ব্যঙ্গ, উপদেশ ইত্যাদি।

বিবার ও অলংবার যুগের পর ১৯৫২ সালে বোড়ো সাহিত্য দিবস পালিত হয়। এর সূচনা থেকেই বোড়ো সাহিত্যের আধুনিক বা বর্তমান যুগ শুরু বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সম্পাদিত 'সনাকি বিজাব' (শামুক গ্রন্থ) নামে একটি কাব্য-সংকলন। এতে স্থান পেয়েছে সমসাময়িক কালের প্রধান ও নবীন কবিদের ভিন্ন ভিন্ন আবেগ-অনুভূতির কবিতা।

১৯৭৫ সলে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম রচিত 'অখ্রাং গংসে নাংগৌ' (চাই একটি আকাশ) নামে কবিতার বইটি। এতে সংকলিত হয়েছে আধুনিক প্রতীকবাদী, বিপ্লবী ও সাম্যবাদী ভাবধারার কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থের জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম সম্মানিত হয়েছেন 'সমেশ্বরী ব্রহ্ম' পুরস্কার ও 'প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম জিউনাং বান্‌থা' (জীবনব্যাপী সাধনার জন্য প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম

পুরস্কার) সম্মানে। ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বিবার জানানৈ' (ফুল হয়ে) (১৯৭৫), 'আং ফাইফিনগৌন' (আমি ফিরে আসব) (১৯৯৫), 'বিবারী গাওদাং' (প্রস্ফুটিত পুষ্প) (২০০৮) ইত্যাদি। প্রণয় ও রোম্যান্সের ভাবসমৃদ্ধ সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর কবিতার বই 'রাদাব্' (খবর) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র ব্রহ্ম ও কামাখ্যা ব্রহ্ম নার্জারির 'গুথাল' (ঢেউ) নামক কাব্যগ্রন্থ। প্রথমজনের কবিতার সংখ্যা ১৯ আর দ্বিতীয়জনের ১১। দুজনের কবিতাতেই ধরা পড়েছে দেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবধারা। কামাখ্যা ব্রহ্ম নার্জারির প্রতীকী কবিতার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'বনজার' (মশাল) কবিতাটি। ১৯৭৬ সালে নন্দেশ্বর বোড়ো রচিত 'গৌসৌনি বারহুংখা' (হৃদয়ের তুফান) ও 'সুবুংনি রাহা' (মানবিক পন্থা) নামে দুটি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই দুটি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে জনসাধারণের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কোকরাঝাড়ের প্রতিষ্ঠিত কবি প্রসেনজিৎ ব্রহ্মের 'আং থৈয়া' (আমি মরব না) নামক কাব্য-সংকলন সারস্বত সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করতে বোড়ো ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক বই লিখেছেন অধ্যাপক মধুরাম বোড়ো, ড. অনিলচন্দ্র বোড়ো, ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি প্রমুখ। এ-ছাড়া পত্রপত্রিকাতেও বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের অধ্যয়ন সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষা হিসাবে বোড়ো ভাষা ওপরের সারিতে উঠেছে, সাহিত্য অকাদেমিও এই ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে কুড়ি শতকের শেষপর্বের বোড়ো ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার বই ও লেখকের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরলাম—

(১) রিংখাং (প্রতিধ্বনি)। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত। লেখক লকেন্দ্র বসুমতারি। ১৯৭০ সালেই প্রকাশিত হয় ধরণীধর ওয়ারিব রচিত 'মৌদৈ' (অশ্রু) নামক কাব্য-সংকলন। ১৯৭৫ সালে ফুলেন বোড়োর 'লাইমৌন' (তরুণী)। ১৯৭৬ সালে হরিহর ব্রহ্মের 'বেরেমৌদৈ' (মধু)। এই সময়েই প্রকাশিত হয় নন্দেশ্বর বোড়োর 'গৌসৌনি বারহুংখা' (হৃদয়ের তুফান), রামদাস বোড়োর 'ফেফিন' (ফিরে এসো)। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বাণেশ্বর বসুমতারির 'ডিমাপুর' (একটি স্থানের নাম), 'জাগ্মিবান' (বিদ্রোহী) এবং মনোরঞ্জন লাহারির 'মাব্লাবা' (কখনো) উল্লেখযোগ্য।

(২) ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় সাগ্রাম চৌধুরীর 'জিউনি লৈথোয়ায়' (জীবনের বন্যায়) ও উত্তমচন্দ্র খেরকটারির 'খন্থায় মালা' (কবিতার মালা) নামক দুটি কাব্য সংকলন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় চন্দ্রকান্ত বোড়োর 'জিউলামা' (জীবনের পথ) ও গুণেশ্বর মুসাহারির 'হা ফিসা হৌয়া' (এক ধরনের বুনো পাখি)। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় অনজু রচিত 'নৌংনি জিউ আংনি বিবুংথি' (তোমার জীবন আমার বক্তব্য) ও বিমলচন্দ্র ব্রহ্মের 'জাহার' (ঝাড়) নামক কাব্য- সংকলন। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় মানবকুমার রামসিয়ারির 'হায়নারী জাইখ্লং' (অপরূপ রামধনু) ও গুণেশ্বর মুসাহারির 'ফেরেংগা দাও' (এক ধরনের কালো পাখি) নামক কবিতার বই দুটি। ১৯৮৫ সালে রমাকান্ত বসুমতারির 'দাওহানি খন্থায়' (যুদ্ধের কবিতা) ও রাজেন্দ্রনাথ বোড়োর 'বাঁদৌর' (উতলা মন) প্রকাশিত হয়।

(৩) ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে অরবিন্দ উজীরের 'মৌন্দাংথিনি রৌজাবথায়' (অনুভবের গান) এবং অনজুর 'ফাসিনি দোলেঙাও অখাফৌর' (ফাঁসে ঝুলন্ত চাঁদ)। পরবর্তীকালে আর সাম্প্রতিক সময়ে বোড়ো সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হিসাবে বোড়ো কবিতার রচনা, চর্চা ও বিকাশ হয়েই চলেছে।

অসমের রাজ্যভাষা অসমিয়া। এ-রাজ্যে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত বোড়ো ভাষা। এই ভাষা মূলত বোড়োল্যান্ড স্বশাসিত পরিষদ অর্থাৎ এর অন্তর্গত চারটি জেলায় সহযোগী রাজ্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এ ছাড়া গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্গত হয়েছে বোড়ো ভাষা। সাহিত্য অকাদেমি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত হয়ে বোড়ো ভাষা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বোড়ো সাহিত্য সভা, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কোকরাঝাড়ে স্থাপিত বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তরে বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, গবেষণা কর্মসূচি সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমাদের বি. বরুয়া কলেজের স্নাতক তথা সংস্কৃত ভাষার মেধাবী ছাত্র আয়ুষ্মান মধুরাম বোড়ো পুণের ডেকান কলেজ থেকে ভাষাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। এরপর তিনি বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের প্রচুর গবেষণামূলক বইপত্র ইংরেজি, অসমিয়া ও বোড়ো ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে আমার খুব আনন্দ হয়। মহিশূরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থা ও পুণের ডেকান

কলেজের মাধ্যমে বোড়ো ভাষার চর্চা ও গবেষণা করছেন বোড়ো সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পণ্ডিত ও ছাত্রছাত্রী। বোড়ো ভাষা-সাহিত্য নিয়ে বইপত্র প্রকাশ ও আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে মধুরাম বোড়োর প্রভূত অবদান রয়েছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক রোহিণীকুমার মহন্তের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আরও কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। এঁরা হলেন ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাণীকান্ত শর্মা, ড. সত্যেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী, ড. ভূপেন্দ্র নার্জারি, বোড়ো বিভাগের বর্তমান অধ্যাপক ড. স্বর্ণলতা দৈমারি সহ অন্যান্য অধ্যাপক। এঁদের সহযোগিতাতেই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোড়ো ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বহুমুখী চর্চা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্বাগত জানাই ভাষাবিজ্ঞানী ড. জ্যোতি তামুলি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ড. উমেশ ডেকার অবদানকে। লোকসংস্কৃতি গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিল বোড়ো ইংরেজিতে বোড়ো লোকসংস্কৃতির গবেষণা আর বোড়ো সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশিত যাবতীয় বইপত্র ঘেঁটে দেখার সময়-সুযোগ আমার নেই। তবু সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'বোড়োল্যান্ড' নামে বোড়ো-অসমিয়া মাসিক পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। আমাদের বি. বরুয়া কলেজের কৃতী ছাত্র ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি (রঙিয়া কলেজের অধ্যাপক) 'বোড়োল্যান্ড' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'বোড়ো সাহিত্য : অতীত ও সাম্প্রতিক ধারাবাহিকতা' বিভাগে। সেগুলি পড়ে আমি বড়ই আনন্দিত আর উপকৃত হয়েছি। আমার গবেষণাগ্রন্থ তথা প্রয়াত বোড়ো লেখক ভবেন্দ্র নার্জারির রচনাবলি, অধ্যাপক ড. প্রফুল্লদত্ত গোস্বামীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখালিখি, ড. বাণীকান্ত কাকতি, ড. বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহত্ত্বপূর্ণ রচনাবলির উপর নির্ভর করে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতার নিদর্শন হিসাবে কয়েকজন কবির কবিতার ভাবানুবাদ পেশ করছি। এই কবিরা হলেন প্রয়াত রূপনাথ ব্রহ্ম, মদারাম ব্রহ্ম, ঈশান মুসাহারি, প্রসেনজিৎ ব্রহ্ম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বোড়ো কবিতাগুলির আড়ালে যে-সমাজ বিদ্যমান, তা ভারতের অসমিয়া, বাংলা ইত্যাদি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষার মতোই ব্রিটিশ শাসনাধীন বা তার পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন নির্বাহের পরিচায়ক। ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়, মোঙ্গলয়েড কিরাত, অস্ট্রোলয়েড শবর গোষ্ঠীর জনগণের উপর ভারতবর্ষীয় নর্ডিক আর্য হিন্দুর ধর্মীয় প্রভাব কম-বেশি পড়েছে। এ-দিকে ভারতের আর্য ও অনার্য জনগণের জীবন, চিন্তাধারা, প্রকাশভঙ্গি, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদিতে পড়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসা-বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা ও ব্রিটিশরাজের বহুমুখী প্রভাব। ব্রিটিশ যুগে খ্রিষ্টান পাদরিদের মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার হয়েছে।

এ-ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রভাব পড়েছে তন্ত্রমন্ত্র, শ্লোক, গীতিকা, দৃষ্টান্ত, প্রবাদ-প্রবচন, গল্পগাথা ইত্যাদির। ড. প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী ও আমার লেখা ভূমিকা-পরিশিষ্ট সংকলিত দুটি বই আছে প্রয়াত ভবেন্দ্র নার্জারির। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত এই দুটি বইয়ের নাম 'বোড়ো কছারির (কাছাড়ির) জন সাহিত্য' (১৯৫৭) ও 'বোড়ো কছারি সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৬৬)। বই দুটিতে প্রচুর সাহিত্যিক-সামাজিক ও ভাষাগত তথ্য-উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। নিদর্শন হিসাবে বোড়ো কবিতার ভাবানুবাদ তুলে ধরলাম। রাজর্ষি-প্রতিম রূপনাথ ব্রহ্ম রচিত 'ঈশ্বরনি নাম গদৈ' (ঈশ্বরের নাম মিষ্টি) কবিতাটির ভাবানুবাদ :

ঈশ্বরের নাম মিষ্টি
পিতা ঈশ্বরের নামের মতো
মিষ্টি আর কিছু নেই।
হায়! সেটাই জেনো মূল কথা।
হঠাৎ একবার তাঁর নাম নিলে
হঠাৎ একবার তাঁর নাম আওড়ালে
আবার একবার নাম নিতে
আবার একবার নাম আওড়াতে
ইচ্ছে হবে।
দুঃখের সময়ে বিপদের কালে
তোমার মনে শান্তি দেবে।
পিতা ঈশ্বরের নামের মতো
মিষ্টি আর কিছু নেই।
হায়! সেটাই জেনো মূল কথা।
সন্তান-সন্ততি আসল নয়,
সংসারের সুখই সুখ নয়।
সুখ পাবে অল্প সময়
দুঃখ আসবে তারই পরে।
পিতা ঈশ্বরের মিষ্টি নাম

মানুষ যে নেবে কবে?
হায়! যতক্ষণ নেবে
ততক্ষণ সুখ লাভ করবে।
হে পিতৃজনেরা! হে মাতৃজনেরা!
সেই পিতার নামই সার কথা।
পিতা ঈশ্বরের নামের সমান
সুখ নেই, মিষ্টিও নেই।

ধর্মীয় অনুভূতি সহ এভাবেই পরম শক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন কবি রূপনাথ ব্রহ্ম। ১৯২৩ সালে মদারাম ব্রহ্মের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁর 'খন্থায় মেথায়' (কবিতা ও গান) নামক কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শই প্রতিভাত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে তুলে ধরলাম 'বোড়োল্যান্ড' পত্রিকার (ফেব্রুআরি ২০০৩) 'বোড়ো কবিতার ধারাবাহিকতা' বিভাগে প্রকাশিত রঙিয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারির সুচিন্তিত মতামত :

'বোড়ো ভাষায় লিখিত কবিতার পরম্পরা শুরু হয়েছিল পদ্যধর্মী রচনা দিয়ে। পদ্যধর্মী হলেও এগুলির সাহিত্যিক তথা নান্দনিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা ওই পদ্যগুলিতে রয়েছে আলংকারিক গুণ। তা ছাড়া সেগুলি রচিত হয়েছে বিভিন্ন ছন্দসজ্জায়।'

উল্লেখ্য, 'বিবার' পত্রিকায় বাংলা আর অসমিয়া ভাষায় কবিতা প্রকাশ করে সমন্বয়ের আদর্শও তুলে ধরা হয়েছিল।

১৯২০ সালে প্রকাশিত প্রসন্নকুমার বোড়ো খাকলারির 'বাথুনাম বৈখাগুনি গীদু' (বাথৌ বন্দনা বিহু গীত) বইটি থেকে পয়ার ছন্দের নমুনা হিসাবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরলাম :

মায়নো বুড়ী বিমান বুড়ী আই নুং জুংনি।
বব-বাঞ্ছা হবায় থায়ু নায়ো থানানি।।
খাংখালা খারি খারি ভগমাথানি আলি।
মাখানানি বিবাগ আইনি নাকবালি।।

ভাবানুবাদ :

লক্ষ্মীদেবী তুমি, আমার মা তুমি।
আশীর্বাদ দিয়ে যাও ঘরে থেকে তুমি।।
খাংখালা বনের সারি সারি বসুমতীর আলি।
'মাখনা'র ফুলই মায়ের নাকছাবি।।

সেই সময়ে বাংলা লিপির ব্যবহার হত। মদারাম ব্রহ্ম আর রূপনাথ ব্রহ্মের পদ্য রচনার অন্তরালে জাতীয় প্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও মানবতাবোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপনাথ ব্রহ্মের রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'-র অনুরণন তথা ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি যার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন :

হায় তুমি কে?
হৃদয়ের নিভৃত কোণে রয়ে
ছেরজা বাজাও গগলিংগ (সারেঙ্গিতে বাজাও চিলের
মতো এক পাখির কান্নার সুর)
হায় তুমি কে?
দেখি কি দেখি না ধোঁয়াশা
আসে কি আসে না মরীচিকা
হায় তুমি কে? (রূপনাথ ব্রহ্ম)

তুলনীয় :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
(রবীন্দ্রনাথ)

এ-প্রসঙ্গে ঈশানচন্দ্র মুসাহারি ও প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্মের কয়েকটি কবিতার উৎকর্ষ বিচার করে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন ড. বসুমতারি। ঈশানের কবিতাগুলি হল— 'বাদারি' (কাঠুরে), 'হাজৌ' (পাহাড়), মৌনাবিলি (সন্ধ্যা/গোধূলি)। প্রমোদ ব্রহ্মের কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'হায়েমনি চুফিম' (সমতলের সুরেলা সুর), 'দৈ বাজুম' (জলপ্রপাত) ইত্যাদি।

ঈশানচন্দ্র মুসাহারির 'বাদারি' নামক উৎকৃষ্ট কবিতাটির অসমিয়ায় ভাবানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি। সেটাই এখানে বাংলায় তুলে ধরলাম :

সূর্য ডুবেছে
সন্ধ্যা নেমেছে।
'যাসনে আর পানসি'
ওই যে বলল চিৎকার করে।
'হায় এ কোন্ গ্রাম
এসেছি আমি ইনিয়ে বিনিয়ে'
— হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম
যখন আমি এভাবে

কলস ভরা গাগরি
কাঁখে নিয়ে
বেদনা বিধুর মনে
যুবতী গেল দূরে সরে।
সাঁঝের মেঘলা আকাশে
সূর্য ডুবলে
তুমি যে কী অপরূপ গ্রাম
চিরদিন থাকবে যে মনে।

প্রথিতযশা কবি প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্মের 'দৈ বাজুম' কবিতার ভাবানুবাদ :

রা রা রা রা
রৌ রৌ রৌ রৌ
জাম জাম জুম জুম
গ্রৌ গ্রাও গ্রৌ গ্রৌ
বাঁধ ভেঙে
খুঁজেছি আমি
চিরদিনের ঠাঁই।

কেটে ছেঁটে সাফ করে
দুরন্ত নদ আমিই ব্রহ্মপুত্র
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে
কেউ যেন আমাকে মারছে সপাটে
কেউ যেন আমাকে ধরেছে টেনে
কিছুই জানি না আমি
এগোতে হয় বলে এগিয়ে যাচ্ছি
গতিই আমার লক্ষ্য
পথ যা-ই হোক-না কেন গতির শেষ অবধি
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে।
সমস্ত সৃষ্টি ধাবমান হলে
হে ব্রহ্মাণ্ড, আমিই একলা অলস হয়ে থাকব কি?
তোমার ইচ্ছানুযায়ী?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ
এই দ্যাখ, তোর মাথার ওপর দিয়েই ঝাঁপাই
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে।
কেউ-বা করছে আরতি অজানা থানে
খাম, জথা, সিফুং বাজিয়ে
সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমিও এগোই
দুরন্ত নদ আমিই ব্রহ্মপুত্র
দাও আমায় পথ ছেড়ে
রা রা রা
রৌ রাও রৌ রাও...

অসমিয়া কবিতার ক্ষেত্রেও আধুনিক যুগের শিউলি কবি রত্নকান্ত বরকাকতি, রোমান্টিক কবি নবকান্ত বরুয়ার ওপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। অসমের বরেণ্য শিল্পী শোভারাম ব্রহ্ম বোড়ো ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ ও প্রকাশ করে চিরন্তন কীর্তি স্থাপন করেছেন। একের পর এক বোড়ো কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সাহিত্য অকাদেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমির ক্ষেত্রে অসমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি, খাসি প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীর সৃষ্টিরাজি স্বীকৃত ও সমাদৃত হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে আমাদের আশঙ্কা, নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা তথা কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারেননি। কেন্দ্র তথা রাজ্য স্তরে আরও বেশি যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়েও নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা তথা ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কবিতা সহ যাবতীয় সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিবিম্ব সে-জন্য সমাজের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ভিত্তিতেই সৃষ্টি, বিকাশ আর পর্যালোচনা যুগোপযোগী তথা সর্বজন সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু কবিতাই নয়, বোড়োদের সামগ্রিক সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, নাটক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

১৯৫২ সালের ১৬ নভেম্বর বোড়ো সাহিত্য সভা (বোড়ো থুনলাই আফাদ) স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বোড়ো ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 'অভিলাষী জাগরণ' সৃষ্টি হয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে প্রসেনজিৎ ব্রহ্ম, সমর ব্রহ্ম চৌধুরী, মনোরঞ্জন লাহারি, কমলকুমার ব্রহ্ম, নীলেশ্বর, জোসেফ দৈমারি প্রমুখের জন্য। বোড়ো ভাষার গবেষণা, অধ্যাপনা, চর্চা ও ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়নের অবিরত যাত্রায় ১৯৫১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গুরুর কৃপায় যথাসাধ্য ব্রতী হয়ে পুণ্যকর্ম করেছি বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছি। ১৯৫২ সাল থেকে 'অখাফীর' (চাঁদ), 'বোড়ো লিরথুম বিলাই' (বোড়ো সংকলন পত্রিকা) ইত্যাদি পত্রপত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। 'বোড়ো থুনলাই

আফাদ'-এর (বোড়ো সাহিত্য সভা-র) স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবি সম্মেলন হয়েছে। গঠিত হয়েছে বোড়ো পাঠ্য বই সমিতি। ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিরত সাহিত্য সেবা, বোড়ো ভাষার লিখিত রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে লিপি বিষয়ক আন্দোলন, রাজ্যভাষা হিসাবে বোড়োর মর্যাদা লাভের গণসংগ্রাম, সাহিত্য অকাদেমির স্বীকৃতি, পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, গবেষণা কর্মসূচি, অভিধান প্রণয়ন কর্মসূচি— এ-সবের জন্য বোড়ো জনগণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও সর্বভারতীয় বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আর পর্যায়ক্রমে সমস্যা সমাধানের সাক্ষী হয়ে আমাদের মনে হয়েছে, অতীতের বোড়ো ও বোড়োপ্রেমী লোকেদের ঐকান্তিকতা ও স্বদেশপ্রীতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বহু শহিদ ও জাতীয় নেতার অনবদ্য অবদানও আমার মানসপটে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন— ধর্মগুরু কালীচরণ ব্রহ্ম, বোড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, রাজর্ষি রূপনাথ ব্রহ্ম, পদ্মশ্রী মদারাম ব্রহ্ম, সমাজসেবী সতীশচন্দ্র বসুমতারি, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরী, কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, রামদাস বসুমতারি, লক্ষেশ্বর ব্রহ্ম, মোহিনীমোহন ব্রহ্ম, বিনেশ্বর ব্রহ্ম, রামচরণ ব্রহ্ম, মঙ্গলসিং হাজোয়ারি, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, ভবেন্দ্র নার্জারি, কামেশ্বর ব্রহ্ম, মঙ্গলচণ্ডী ব্রহ্ম, রমেশচন্দ্র বোড়ো, বীরেন্দ্রনাথ দাস বোড়ো, রতিকান্ত স্বর্গিয়ারি, জয়ভদ্র হাগজের, সোনারাম থাওসেন, রাজেন্দ্রলাল নার্জারি, যাদবচন্দ্র খাকলারি প্রমুখ। জনগোষ্ঠীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবার প্রতি বহুমুখী অবদান রয়েছে ব্রিটিশযুগের বিদেশী মিশনারি সহ প্রকাশক-লেখক-চিকিৎসক প্রমুখের। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন, রেভারেন্ড সিডনি অ্যান্ডেল, জে. ডি. হ্যান্ডারসন, রেভারেন্ড হলভর শ্রুদ, দীনেশচন্দ্র নার্জারি প্রমুখের নাম আমার ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থের (প্রকাশকাল ১৯৭৭) প্রথম সংস্করণেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে বোড়ো সাহিত্য সভার মুখপত্র 'বোড়ো' পত্রিকার প্রকাশ যথেষ্ট সুযোগ এনে দিল সাহিত্যসেবীদের। কবিতার বিষয়বস্তু, ছন্দসজ্জা, উপমা ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ক্রমশ এগিয়েছে। কটন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টায় রণেন্দ্রনারায়ণ বসুমতারির সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অখাফীর' (চাঁদ) (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। সমালোচক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারির উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি, "এতে প্রকাশিত কবিতা ও ছোটগল্প সেই সময়কার সৃষ্টিশীল বোড়ো সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।" উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রসেনজিৎ ব্রহ্মের 'আং থৈয়া' (আমি মরব না) এবং সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর 'চিজৌ গেরেমচা' (অমর চিজৌ) কবিতা দুটির বিষয়বস্তু যেমন অনন্য তেমনই মুক্তক ধরনের ছন্দের ব্যবহারে তা সোনায় সোহাগা হয়েছে।

'আং থৈয়া' (আমি মরব না) কবিতাটির আংশিক ভাবানুবাদ তুলে ধরা হল নিদর্শন হিসাবে।

এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আমি
সেই ডাইনোসর নই
অথবা সাইবেরিয়ার উঁচু বুকের নিভৃত স্থানের
শুকনো নির্জীব ম্যামথ নই
আমি সেই অনাদিকালের
মামুলি ফসিলও নই
আমি আফ্রিকার ডোডো পাখিও নই
কাজিরাঙার গন্ডার নই।
চাই না আমার
জুলজিক্যাল মিউজিয়াম
ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট,
আমি মানুষেরই একজন
আমি মানব
সৃষ্টির আদিকাল থেকে
আজ পর্যন্ত চলে আসা
মৃত্যুহীন মানব।

উচ্চ পর্যায়ের এক রোমান্টিক কবি সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর 'মহাবুদ্ধনি তপস্যা' নামক কবিতার ভাবানুবাদ তুলে ধরলাম প্রজ্ঞা বন্দনার নিদর্শন হিসাবে :

সোমাশ্রী, ছাইরঙা ধূসর রাত
হিংস্র বাঘের মতো চোখে জ্বালিয়ে আগুন
মহাবুদ্ধের মতো তপস্যায় আমি মগ্ন
মহাবুদ্ধের তপস্যা...
হায় ভগবান, রাত পোহাতে আর কত দেরি?
হৃদয়ে কাঠুরের কুটিরে প্রজ্বলিত

গভীর অরণ্যের একটু আগুন।
তবু আমি যেন দুচুমায় বিলের জলাধার
স্রোতবিহীন অচল নিথর নিঝুম নীরব।

(বোড়োল্যান্ড : মার্চ ২০১৩)

আরও একজন রোমান্টিক কবি মনোরঞ্জন লাহারির 'মিথিংগা' (প্রকৃতি), 'হৈ ফৈছালি' (হে দিগন্ত) ইত্যাদি কবিতার আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য। যেমন :

সাগরের বহতা স্রোতের
আমি এক ফোঁটা জল
জীবন আমার দুদিনের
তুমি চিরদিনের
আমি এখনই এসেছি এখনই যাব
হে প্রকৃতি
আমার শুধু এটাই প্রার্থনা
আমার মৃত্যু হলে তোমার শীতল বুকে
যেন দিয়ো একটু ঠাঁই। (মিথিংগা)

বোড়ো সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্মের সত্তরের দশকের আধুনিক কবিতার নিদর্শন হিসাবে 'চাই একটি আকাশ' নামক কবিতাটির ভাবানুবাদ পেশ করছি :

একটি নীল আকাশের আকাল আমাদের
আজ আমাদের চাই
পবিত্র মুক্ত সমীর
যার হৃদয়ে কখনো ধ্বনিত হয় না
সংকীর্ণ সীমার আকাশ।
পূর্ণ হল যেখানে রিক্ত কায়া
হলাহল ওগরায় সেখানেই ক্ষুধাতুর হিয়া।
সেজন্যই আজ
ইতিহাসের সেই চারটি রঙের আভা
বিচিত্র তার ঘৃণ্য রেখা
সেই অর্থের বিভ্রান্ত চিন্তা
তারই অমৃতবৃক্ষে বিষফল।

'অখ্রাং গাংচে নাংগৌ' (চাই একটি আকাশ) (১৯৭৫) নামক কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আধুনিক বোড়ো কবিতার এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম। তাঁর 'বাল্মীকি' কবিতাটি উচ্চ প্রশংসিত।

নয়ের দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিজয় বাগলারি, অন্‌জু, অরবিন্দ উজির, রমাকান্ত বসুমতারি, অনিল বোড়োর আধুনিক কবিতাগুলি রূপ-রস, সাজসজ্জা, মুক্ত ছন্দ, কথা ছন্দ, প্রতীকী ভাষার প্রয়োগে এক বিচিত্র জগৎ গড়ে তুলেছে। অরবিন্দ উজিরের 'গিনার' (ভয়), 'চৌদৌবনি চৌলের' (শব্দের শরীর) ; অন্‌জুর 'গৌবী দৈমা' (হৃদয় নদী) সাম্প্রতিক বোড়ো কবিতার অপরূপ নিদর্শন। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা কবিতাও আছে বোড়োতে। সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরীর লেখা ফুলেশ্বরী দৈমারি বিষয়ক কবিতাটি অসমিয়াতে রচিত হলেও, বোড়ো ভাষায় এর প্রতিরূপ মনোগ্রাহী হবে নিশ্চয়ই।

দেখা যাচ্ছে, অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দির মতো বোড়ো কবিতাতেও বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের পটভূমি। এগুলিতে ভাব-রস-ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগের মাধ্যমে জয়যাত্রার সূচনা করেছে বোড়ো কবিতা। বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ নিয়ে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে কয়েকটি মাত্র বিষয় তুলে ধরলাম।

ভারতে আদিকবি বাল্মীকির যুগ থেকে মহাকবি কালিদাস প্রমুখের মাধ্যমে বহমান রসাত্মক-ধ্বন্যাত্মক কাব্যপ্রবাহে মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য, মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ আরাধ্য পূর্বপুরুষের প্রতি হৃদয়ের বন্দনা জ্ঞাপন করছি কবিরাজ মাধব কন্দলির ভাষায়—

সমস্ত রসক কোনে বুজিবাক পারে।
কবি সব নিবন্ধায় লোক ব্যবহারে।

'বহুজন হিতায়' নীতিতে এগিয়ে গেলে সর্বজনের হিতসাধনের পথ খুলে যাবে। আর সেটাই আমাদের শিবরূপী কিরাত ও উমারূপী শবরীর চরণে নিবেদন। ❑